ভাগবতী তনু

॥ প্রথম খণ্ড ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

প্রিয়বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ :

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (চার খণ্ডে সম্পূর্ণ)

পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)

জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

ভক্ত বিবেকানন্দ

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

গরীয়সী গৌরী

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

উদ্যত খড়্গ (সুভাষচন্দ্রের জীবনী ১ম, ২য় খণ্ড)

গৌরাঙ্গপরিজন

ভাগবতী তনু

॥ এক ॥

'হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসঙ্কট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সম্বল হয়ে থাক।'

এই প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের।

খড়দা আর সোদপুরের মাঝখানে পেনেটি। সেখানে ছাতুবাবুর বাগান-বাড়িতে এসেছে রবীন্দ্রনাথ। বালক রবীন্দ্রনাথ।

এসেছে ডেঙ্গুজ্বরের ভয়ে। ডেঙ্গুজ্বরের মড়ক লেগেছে কলকাতায়।

এই প্রথম বাইরে আসা। ইট-কাঠ-পাথরের খাঁচার বাইরে মুক্তাঙ্গন বিশ্বকে সম্ভাষণ করা।

গঙ্গাতীরেই বাগানবাড়ি। বারান্দার সামনে পেয়ারা বন। পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে বারান্দায় বসে থাকে রবীন্দ্রনাথ। নৌকো দেখে। দাঁড় টেনে পাল তুলে ভেসে চলেছে নৌকো, কোন নাম না-জানা বিস্ময়ের বন্দরে। মানচিত্রের সীমানা না মেনে, ভুগোলের গণ্ডি পেরিয়ে চিরন্তন রহস্যরাজ্যে।

এই রহস্যটিই আদিম ও অন্তহীন। আর আমার দুই চোখে বালকের সদ্যোজাগ্রত বিস্ময়।

দেখি আর অবাক হই। অবাক হয়ে দেখি কিন্তু প্রকাশের ভাষা নেই। 'কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে।' ভাষার শেষ আছে অভিধানে কিন্তু অনুভবের অভিধান কোথায়?

মনে মনে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ে। যে বাড়ি থাকলে রাজার বাড়ি হত না সেই রাজার বাড়ির খোঁজে। নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে যেসব নৌকো,

তারই একটার সোয়ারি হয়ে। কল্পনার অমরাবতীকে সে ছুঁয়ে আসবে। সৌধ-চূড়ের একটি সোনার প্রদীপ ডাকে বুঝি তাকে হাতছানি দিয়ে।

'কোথায় আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।'

সে তো মনে, কিন্তু বাস্তবে ?

কী আছে বাস্তবে, দেখাই যাক না। অচেনাকে আমার ভয় কী! আমার মাও তো অচেনা ছিল কিন্তু নিল তো কোল পেতে!'

'ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমায় কোলে।

সকল প্রেমই অচেনা গো, তাই তো হৃদয় দোলে।'

কিসের টানে কে বলবে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বেরিয়ে পড়েই দেখল পায়ে শেকল আঁটা।

আগে আগে যাচ্ছেন দুজন অভিভাবক। পিছনে কে আসছে তারা টের পেয়েছেন।

'এ কী তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

ম্লানমুখে থমকে দাঁড়াল রবীন্দ্রনাথ। ধরা পড়ার মানে কী, যেন বুঝতে পেরেছে নিমিষে।

'ছি ছি, এ তোমার কী পোশাক! যাও যাও এখুনি ফিরে যাও।

পোশাকে কোথায় ত্রুটি বুঝতে দেরি হল না। রবীন্দ্রনাথের গায়ে জামা থাকলেও চাদর নেই, আর পা জুতোপরা থাকলেও মোজা-ছাড়া।

ফিরে এল বাড়িতে। বসল এসে বারান্দায়। অম্লান চোখে দেখতে লাগল গঙ্গাকে।

ত্রুটি সংশোধন করবার উপায় নেই। যার মোজাও নেই চাদরও নেই তার কলঙ্কমোচন হয় কী করে ?

কিন্তু গঙ্গাই সমস্ত নিষ্কলঙ্ক নির্বন্ধন করে দিল। মনকে ছুটি দিল জলস্রোতে। স্রোতে ভাসতে মনের সাজসজ্জা লাগে না। কারু সাধ্য নেই মনের পায়ে শিকলি এঁটে খাঁচায় পুরে বন্দী করে। দূর দেশে ভেসে যাই, পরীর বাড়ির বন্ধ দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারি।

যেখানে বেগ সেখানেই মুক্তি। যেখানে স্রোত সেখানেই স্বচ্ছতা। একটি মুক্তিবিস্তারিণী আনন্দময়ী নদী সেই কবে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে।

শুধু কর্ম আর কলধ্বনি—নদী এক নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম।